بسم اللہ الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২০ ডিসেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ২০ ফাতাহ্, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় সাহাবীদের স্মৃতিচারণে হযরত উতবাহ্ বিন গাযওয়ান (রা.)-সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, যা শেষ হয় নি অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে আরো কিছু বিষয় রয়েছে, যা এখন বর্ণনা করব। ২য় হিজরী সনে মহানবী (সা.) তাঁর ফুফাতো ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.)-এর নেতৃত্বে নাখলা অভিমুখে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। হযরত উতবাহ্ (রা.)ও এই অভিযানে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পূর্বেও একজন সাহাবীর বরাতে এই অভিযানের কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, এখন আবার কিছুটা সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন,

মহানবী (সা.) খুব কাছে থেকে কুরাইশদের গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখার সিদ্ধান্ত নেন যাতে এ সম্পর্কে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সংবাদ যথাসময়ে পাওয়া যায় এবং সর্ব প্রকার অতর্কিত আক্রমণ থেকে মদিনা নিরাপদ থাকে। কাজেই এই উদ্দেশ্যে তিনি (সা.) আটজন মুহাজীরের একটি দল গঠন করেন, কৌশলগত কারণে এই দলে এমন লোকদের রাখেন যারা কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখত– যাতে কুরাইশদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করা সহজতর হয় এবং তিনি তাঁর ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.)-কে এই দলের নেতা নিযুক্ত করেন। মহানবী (সা.) এই অভিযান পরিচালনার সময় এই অভিযানের আমীরকেও একথা বলেন নি যে, তোমাদেরকে কোথায় এবং কি উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। যাত্রাকালে তার হাতে একটি সীলগালা করা মুখবন্ধ পত্র দেন এবং বলেন, এই পত্রে তোমাদের জন্য নির্দেশনা লেখা আছে। তিনি (সা.) বলেন, মদিনা থেকে দু'দিনের পথ পাড়ি দেয়ার পর এই পত্রটি খুলে এতে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে কাজ করবে।

দু'দিনের পথ পাড়ি দেওয়ার পর আব্দুল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর পত্রটি খুলে দেখেন– তাতে এই বাক্যাবলী লিপিবদ্ধ ছিল যে, তোমরা মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা উপত্যকায় যাও আর সেখানে গিয়ে কুরাইশদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে আমাদেরকে অবহিত কর। তিনি (সা.) পত্রের নীচে এই নির্দেশনাও লিখেছিলেন যে, এই মিশন বা অভিযান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর যদি তোমার কোন সঙ্গী এই দলে থাকতে না চায় এবং ফিরে আসতে চায় (অর্থাৎ, এই পত্র দেখে ও পড়ে এই অভিযানের উদ্দেশ্য অবগত হওয়ার পর তাদের মধ্য হতে কারো যদি কোন অসম্মতি বা আপত্তি থাকে বা দ্বিধাদ্বন্দ থাকে আর ফিরে আসতে চায়) তাহলে সে ফিরে আসতে পারে, এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাকে ফিরে আসার অনুমতি দিয়ে দিও। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশনা তার সঙ্গীদের শোনান আর সবাই একবাক্যে বলেন, আমরা সানন্দে এই দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত। এরপর এই দলটি নাখলা অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং উতবাহ্ বিন গাযওয়ান (রা.)'র উট হারিয়ে যায় আর তারা তা খুঁজতে

খুঁজতে নিজ সঙ্গীদের কাছ থেকে দলছুট হয়ে পড়েন আর অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাদের পায় নি অর্থাৎ নিজ সঙ্গীদের খুঁজে পায় নি। আর এভাবে এখন এই দলটিতে মাত্র ছয়জন সদস্য অবশিষ্ট থাকে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, প্রাচ্যবীদ মার্গোলেস এ সম্পর্কে লিখেছে, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং উতবা (রা.) ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের উট ছেড়ে দিয়েছিলেন আর এই অজুহাত দেখিয়ে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। তিনি (রা.) আরো লিখেন, ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই ব্যক্তিদের ওপর, যাদের জীবনের এক একটি ঘটনা তাদের সাহসিকতা ও আত্মনিবেদনের সাক্ষী আর যাদের একজন বি'রে মঊনার যুদ্ধে কাফিরদের হাতে শহীদও হয়েছেন এবং অপরজন বহু ভয়াবহ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে অবশেষে ইরাক বিজয় করেছেন, শুধুমাত্র নিজের মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে তাদের সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ করা জনাব মার্গোলেস এরই বৈশিষ্ট্য। আরো মজার বিষয় হলো, মার্গোলেস নিজ পুস্তকে এটিও দাবি করে যে, আমি এই পুস্তক সম্পূর্ণরূপে বিদ্বেষমুক্ত হয়ে লিখেছি। যাহোক, এটিই তাদের রীতি, যেখানেই সুযোগ পাওয়া যায়, ইসলাম এবং মুসলমানদের ওপর আপত্তি করার কোন সুযোগ তারা হাতছাড়া করে না। এখন এই অভিযানের আসল ঘটনার দিকে আসছি।

এটি ছিল মুসলমানদের ছোট্ট একটি দল। অতএব তারা যখন নাখলায় পৌঁছে এবং নিজেদের কাজে রত হন, অর্থাৎ তথ্য ও খবরাখবর সংগ্রহের কাজে (নিয়োজিত হন যে,) মক্কার কাফিরদের গতিবিধি কী, তাদের উদ্দেশ্য কী, মুসলমানদের ওপর আক্রমণের কোন ইচ্ছা নেই তো- এসব তথ্য সংগ্রহের কাজে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাদের কয়েকজন নিজেদের লক্ষ্য গোপন রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের মাথা ন্যাড়া করে ফেলেন, যেন পথিকরা তাদেরকে ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে আগত ব্যক্তি মনে করে, কোন সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু একদিন হঠাৎ কুরাইশদের ছোট্ট একটি কাফেলা সেখানে চলে আসে যা তায়েফ থেকে মক্কা অভিমুখে যাচ্ছিল। উভয় দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে যায়। মুসলমানরা পরস্পর পরামর্শ করে যে, এখন কী করা উচিত। মহানবী (সা.) তাদেরকে গোপনে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। রীতিমত আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন নি। কিন্তু অপরদিকে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ উভয়ে মুখোমুখি অবস্থানে ছিল। এখন উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখে ছিল। আর স্বভাবতই এই আশঙ্কাও ছিল যে, কুরাইশদের এই কাফেলার লোকেরা যেহেতু মুসলমানদের দেখে ফেলেছে তাই তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদেরকে প্রেরণ করার বিষয়টি এখন আর গোপন থাকবে না। আরেকটি সমস্যা হলো, কতিপয় মুসলমানের ধারণা ছিল, এই দিনটি হয়ত রজব অর্থাৎ পবিত্র মাসের শেষ দিন, যাতে আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী যুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেছিল রজব অতিক্রান্ত হয়েছে এবং শাবান মাস আরম্ভ হয়ে গেছে। আর কোন কোন রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, জমাদিউল আখের মাসে (তাদেরকে) এই অভিযানে প্রেরণ করা হয়েছিল। এছাড়া এই দিনটি জমাদি'র দিন নাকি রজবের এই সন্দেহ ছিল। কিন্তু অপরদিকে নাখলা উপত্যকা হলো ঠিক হেরেম এলাকার সীমান্তে অবস্থিত। এটিও স্পষ্ট ছিল যে, যদি আজই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া না হয় তাহলে আগামীকাল এই কাফেলা হেরেমের এলাকায় প্রবেশ করবে, যার পবিত্রতা রক্ষা করা আবশ্যকীয়। এক কথায় এসব বিষয় চিন্তা করে অবশেষে মুসলমানরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এই কাফেলার ওপর আক্রমণ করে

হয় তাদের বন্দি করা উচিৎ, না হয় হত্যা করা উচিৎ। যাহোক, তারা আক্রমণ করে আর এর ফলশ্রুতিতে কাফিরদের এক ব্যক্তি নিহত হয় এবং দু'জন বন্দি হয়। চতুর্থ ব্যক্তি সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং মুসলমানরা তাকে পাকড়াও করতে বা ধরতে পারে নি। এভাবে তাদের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয় নি। এরপর মুসলমানরা কাফেলার মালপত্র করতলগত করে। কুরাইশদের একজন যেহেতু জীবন রক্ষা করে পালিয়ে গিয়েছিল, আর এটি নিশ্চিত ছিল যে, এই লড়াইয়ের সংবাদ খুব শীঘ্রই মক্কায় পৌঁছে যাবে, তাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ এবং তার সঙ্গীরা গণিমতের সম্পদ নিয়ে দ্রুত মদিনায় ফিরে আসেন।

এ সম্পর্কে মার্গোলেস সাহেব লিখেন, সত্যিকার অর্থে মুহাম্মদ (সা.) জেনেশুনে এই দলটিকে পবিত্র মাসে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, কেননা এই মাসে কুরাইশরা স্বাভাবিকভাবেই উদাসীন থাকবে আর মুসলমানরা তাদের কাফেলাকে লুটপাট করার সহজ এবং নিশ্চিত সুযোগ পাবে। কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, এত ক্ষুদ্র একটি দলকে এমন দূরবর্তী অঞ্চলে কোন কাফেলাকে লুটতরাজের জন্য পাঠানো যায় না; বিশেষভাবে যখন শত্রুর প্রধান কেন্দ্র খুবই নিকটে অবস্থিত। আর এ বিষয়টি ইতিহাস থেকেও অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, এই দলকে শুধুমাত্র সংবাদ সংগ্রহের জন্যই পাঠানো হয়েছিল। মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন, সাহাবীরা সেই কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছে, তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং এই ছোট্ট দলটি যখন মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে পুরো অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে এবং পুরো বৃত্তান্ত অবগত করে, তখন তিনি (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমি তোমাদেরকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দেই নি। সেইসাথে তিনি (সা.) গনিমতের মালও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এতে আব্দুল্লাহ্ এবং তার সঙ্গীসাথিরা চরম অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন। তারা ধরে নিয়েছিলেন যে, এখন আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অসন্তুষ্টির কারণে ধ্বংস হয়ে গেছি। অন্য সাহাবীরাও তাদেরকে খুবই তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, তোমরা এটা কী করলে!

অপরদিকে কুরাইশরাও হৈচৈ শুরু করে দেয় যে, মুসলমানরা পবিত্র মাসের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছে। নিহত ব্যক্তি আমর বিন আল হাযরামী যেহেতু একজন নেতৃস্থানীয় লোক ছিল এবং মক্কার অন্যতম নেতা উতবা বিন রবীয়া-র মিত্রও ছিল, তাই এই ঘটনা কুরাইশদের রোষানলে ঘৃত ঢালার কাজ করে। তারা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার সাথে মদিনায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেয়। মোটকথা, এই ঘটনায় মুসলমান এবং কাফির উভয়ের মাঝে অনেক বাদানুবাদ চলতে থাকে আর অবশেষে পবিত্র কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয় যার ফলে মুসলমানরা আশ্বস্ত হয়। সেই আয়াতটি হলো,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ

إِنِ اسْتَطَاعُوا (সূরা আল্ বাকারা: ২১৮)

অর্থাৎ তারা তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, ‘এতে যুদ্ধ করা গুরুতর অন্যায় কিন্তু আল্লাহর ধর্ম হতে লোকদের জোরপূর্বক বিরত রাখা পবিত্র মাস ও মসজিদুল হারাম উভয়কে অস্বীকার করা অর্থাৎ এগুলোর সম্মান ক্ষুণ্ন করা, এরপর নিষিদ্ধ বা সম্মানিত অঞ্চল থেকে এর অধিবাসীদের জোরপূর্বক বহিষ্কার করা, হে মুশরিকের

দল! যেমনটি তোমরা করছ, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এসবকিছু পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও ঘৃণ্য। আর পবিত্র মাসে দেশের অভ্যন্তরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা নৈরাজ্য নিরসনে কৃত হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা অধিক গুরুতর অন্যায়।' আর হে মুসলমান! কাফিরদের প্রকৃত অবস্থা হলো, তারা তোমাদের শত্রুতায় এমনই অন্ধ হয়ে যাচ্ছে যে, যে কোন সময় যে কোন স্থানে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে না। বরং তাদের যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ অব্যাহত রাখতো। মোটকথা, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, মক্কার কুরাইশ নেতারা ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের হত্যা ও যুদ্ধের প্রচারণা পবিত্র বা নিষিদ্ধ মাসগুলোতেও নির্দ্বিধায় অব্যাহত রাখতো, এমনকি নিষিদ্ধ মাসগুলোতে সংঘটিত সম্মেলন ও সফরের সদ্ব্যবহার করে তারা এসব মাসে নিজেদের নৈরাজ্যকর কার্যকলাপে আরো বেশি তৎপর হয়ে যেতো। এরপর চরম নির্লজ্জতা দেখিয়ে নিজেদের মনকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে সম্মানিত মাসগুলোকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী এদিক সেদিক স্থানান্তরিতও করতো। এটিকে তারা নসী নামে আখ্যায়িত করতো। অবশেষে তারা সকল সীমা লঙ্ঘন করে অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধীর অধীনে দৃঢ় ও পরিপক্ক চুক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার কাফির ও তাদের সঙ্গীসাথিরা নিষিদ্ধ অঞ্চলে মুসলমানদের এক মিত্র-গোত্রের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে। এরপর মুসলমানরা সেই গোত্রের সমর্থনে বের হলে তাদের বিরুদ্ধেও ঠিক হেরেম শরীফেই তরবারি ধারণ করা হয়।

অতএব পবিত্র কুরআনের (উপরোক্ত) আয়াত অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার এই উত্তরে মুসলমানদের তো শান্তনা বা প্রবোধ লাভ করারই ছিল, কুরাইশরাও কিছুটা নীরব হয়ে যায়। সে দিনগুলোতে তাদের লোকেরা নিজেদের দু'জন বন্দিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মদিনায় এসে উপস্থিত হয়। অপরদিকে যেহেতু সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) তখনও ফিরে আসেন নি তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তাদের বিষয়ে আশঙ্কা ছিল যে, যদি তারা কুরাইশদের হাতে ধরা পড়ে তাহলে কুরাইশরা তাদেরকে জীবিত ছাড়বে না। তাই মহানবী (সা.) তাদের ফেরত না আসা পর্যন্ত কয়েদীদেরকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আমার লোকেরা নিরাপদে মদিনায় পৌঁছলে তবেই আমি তোমাদের লোকদের যেতে দিব। অতএব সেই দু'জন যখন ফেরত আসেন তখন তিনি (সা.) ফিদিয়া বা মুক্তিপণ নিয়ে সেই উভয় কয়েদীকে মুক্ত করে দেন, কিন্তু সেই বন্দিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি মদিনায় অবস্থানকালে মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ এবং ইসলামী শিক্ষার সত্যতায় এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি স্বাধীন হয়েও ফেরত যেতে অস্বীকৃতি জানান এবং মহানবী (সা.)-এর হাতে মুসলমান হয়ে তাঁর (সা.) ভক্তকুলের অন্তর্ভুক্ত হন, অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন আর অবশেষে বি'রে মঊনায় শাহাদত বরণ করেন।

অতএব তার ইসলাম গ্রহণ এবং ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা-ই মার্গোলেস নামক আপত্তিকারী'র আপত্তির জবাব দেবার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু এ বিষয়গুলো তারা দেখেও দেখে না। হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) বদরের যুদ্ধ এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য পেয়েছেন। হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)'র দু'জন মুক্ত কৃতদাস খাব্বাব (রা.) এবং সা'দ (রা.)-এরও তার সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি মহানবী (সা.)-এর দক্ষ ধনুর্বেদদের একজন ছিলেন। হযরত উমর (রা.) হযরত উতবা (রা.)-কে বসরা অভিমুখে প্রেরণ করেন যেন পারস্যের অন্তর্ভুক্ত উবুল্লাহ্'র (জায়গার নাম) অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করে। যাত্রার প্রাক্কালে হযরত

উমর (রা.) তাদেরকে বলেন, তুমি এবং তোমার সাথিরা যতক্ষণ আরব সাম্রাজ্যের শেষ সীমা এবং অনারব সাম্রাজ্যের উপকণ্ঠে না পৌঁছবে ততক্ষণ সফর অব্যাহত রাখবে। অতএব তোমরা আল্লাহ্ তা'লার মঙ্গল ও কল্যাণসহ যাত্রা কর। তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্কে ভয় করবে আর জেনে রাখো, তোমরা ভয়ংকর শত্রুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছ। এরপর তিনি (রা.) বলেন, আমি আশা রাখি, আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, এছাড়া আমি হযরত আলা বিন হাযরামীকে লিখে দিয়েছি, আরফাজা বিন হারসামার মাধ্যমে তিনি যেন তোমাদের সাহায্য করেন, কেননা তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অভিজ্ঞ আর রণকৌশলে খুবই দক্ষ। এরপর হযরত উমর (রা.) বলেন, অতএব তোমরা তার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে এবং লোকদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করবে। যে ব্যক্তি তোমাদের আনুগত্য করবে তার বয়আত গ্রহণ করবে এবং যে ব্যক্তি মানতে অস্বীকৃতি জানাবে তার ওপর কর আরোপ করবে, যা সে নিজ হাতে বিনয়ের সাথে পরিশোধ করবে আর যে ব্যক্তি কর দিতেও অস্বীকার করবে তার ক্ষেত্রে তরবারি ব্যবহার করবে। অর্থাৎ যদি কর দিতে অস্বীকার করে আর নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়, মুসলমানও না হয় উপরন্তু যদি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয় সেক্ষেত্রে তরবারি ব্যবহার করবে, অর্থাৎ তখন তোমাদের কাজ হবে তরবারি ব্যবহার করা। আরবদের মধ্য থেকে যাদের পাশ দিয়েই তোমার অতিক্রম করবে, তাদেরকেই জিহাদের জন্য উৎসাহিত করবে আর শত্রুর সাথে বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ আচরণ করবে, তবে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করতে থাকবে, যিনি প্রকৃতই তোমাদের লালন-পালন কর্তা।

হযরত উমর (রা.) হযরত উতবা (রা.)-কে বসরার অভিমুখে আটশ' লোকসহ রওয়ানা করেন এবং পরবর্তীতে আরও লোকবল দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। হযরত উতবা (রা.) উবুল্লাহ্ অঞ্চল জয় করে সেটিকে বসরার অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বসরাকে শহরে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং তা আবাদও করেছিলেন। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) যখন হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-কে বসরার গভর্ণর নিযুক্ত করেন তখন তিনি খারীবা-য় অবস্থান করেন। খারীবা পারশ্যের একটি প্রাচীনতম শহর যাকে ফার্সীতে 'ভাশতাবাজ উর্দশির' বলা হতো। আরবের অধিবাসীরা এর নাম রেখেছিল খারীবা। জামালের যুদ্ধ এর নিকটেই সংঘটিত হয়েছিল। হযরত উতবা (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন, মুসলমানদের জন্য এমন একটি জায়গা অপরিহার্য যেখানে তারা শীতকাল অতিবাহিত করতে পারে এবং যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে অবস্থান করতে পারে। হযরত উমর (রা.) তাকে লিখেন, তাদেরকে আপনি এমন একটি স্থানে একত্রিত করুন যে স্থান পানি ও চারণভূমির নিকটবর্তী। এটি যদি কোন পরিকল্পনার অংশ হয়ে থাকে তাহলে জায়গা এমন হওয়া উচিত যেখানে পানির ব্যবস্থা থাকবে এবং পশু পালনের জন্য চারণভূমিও থাকবে। এ নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত উতবা (রা.) তাদেরকে নিয়ে বসরা গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। মুসলমানরা সেখানে বাঁশের ঘর নির্মাণ করে। হযরত উতবা (রা.) বাঁশ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এটি ১৪ হিজরী সনের ঘটনা। হযরত উতবা (রা.) মসজিদের কাছেই খোলা জায়গায় আমীরের জন্য গৃহ নির্মাণ করান। মানুষ যখন যুদ্ধের জন্য বের হতো তখন তারা বাঁশ নির্মিত এসব ঘর ভেঙে ফেলত আর সেগুলো বেঁধে রেখে যেত এবং যখন তারা ফিরে আসত তখন ঠিক একইভাবে আবার গৃহ নির্মাণ করত। পরর্তীতে মানুষ সেখানে পাকা বাড়িঘর নির্মাণ করতে শুরু করে। হযরত উতবা (রা.) মেহ্জান বিন আদরাকে নির্দেশ

দেন, যিনি বসরার জামে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তা বাঁশ দিয়ে নির্মাণ করা হয়। এরপর হযরত উতবা (রা.) হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং মুজাশে বিন ওসুদকে নিজের স্থলাভিসিক্ত বা ভারপ্রাপ্ত নিযুক্ত করেন আর তাকে ফুরাতের দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন এবং হযরত মুগিরা বিন শো'বা (রা.)-কে নামাযের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। হযরত উতবা (রা.) যখন হযরত উমর (রা.)-এর কাছে পৌঁছেন তখন তিনি বসরার প্রশাসক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন আর বলেন, এখন আমার জন্য (দায়িত্ব পালন) অনেক কষ্টকর, অন্য কাউকে সেখানকার আমীর নিযুক্ত করে দিন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) তার পদত্যাগের আবেদন গ্রহণ করেন নি। রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তখন তিনি দোয়া করেন– হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এই শহরের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে এনো না। অতএব তিনি তার বাহন থেকে পড়ে যান এবং ১৭ হিজরী সনে তার ইন্তেকাল হয়। এ ঘটনা তখন ঘটে যখন হযরত উতবা (রা.) মক্কা থেকে বসরা অভিমুখে যাচ্ছিলেন এবং সেই স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন যাকে মানুষ মা'দেন বনী সুলায়েম বলে থাকে। আরেকটি ভাষ্য অনুসারে ১৭ হিজরী সনে রাবজা নামক স্থানে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে, তৃতীয় আরেকটি বর্ণনা অনুসারে হযরত উতবা (রা.) ১৭ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে বসরাতে মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি উদরের পীড়ায় ভুগছিলেন। কেউ কেউ ১৫ হিজরী সনকেও তার মৃত্যুর সন বলে অভিহিত করেছেন। হযরত উতবা (রা.)'র মৃত্যুর পর তার কৃতদাস সোয়ায়েদ তাঁর জিনিসপত্র এবং পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে নিয়ে আসেন। হযরত উতবা (রা.) ৫৭ বছর জীবন লাভ করেছেন। তিনি দীর্ঘদেহী ও সুদর্শন একজন মানুষ ছিলেন।

খালেদ বিন উমায়ের আদভী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লার যথাযোগ্য গুণকীর্তন ও প্রশংসাবাক্য পাঠ করার পর তিনি বলেন, পৃথিবী নিজ পরিসমাপ্তির ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে এবং এটি খুব দ্রুতগতিতে প্রস্থান করছে অর্থাৎ পৃথিবী এখন কিয়ামত বা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কোন পানকারী পাত্রে যতটুকু পানীয় অবশিষ্ট রেখে দেয় তা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখান থেকে তোমরা এক অনন্ত গৃহে স্থানান্তরিত হবে। অর্থাৎ জীবন ক্ষণস্থায়ী, অতএব তোমাদের কাছে যা কিছু আছে এর চেয়ে ভালো'তে তোমরা স্থানান্তরিত হও, কেননা আমাদেরকে বলা হয়েছে, একটি পাথর জাহান্নামের তটদেশ হতে ছুড়ে মারা হবে আর তা তাতে সত্তর বছর পর্যন্ত নামতে থাকবে, তথাপি তা এর তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই এই জাহান্নাম পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ পাপীদেরকে এতে নিক্ষেপ করা হবে, কাজেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এ জীবন ধন্য কর এবং পুণ্যের প্রতি মনোনিবেশ কর– একথা বলাই তার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি আরো বলেন, তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো! অথচ তোমাদেরকে বলা হয়েছে, জান্নাতের দু'টো দরজার দূরত্ব চল্লিশ বছর এবং এতে এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন এটি মানুষের সংখ্যাধিক্যে ভরে যাবে। আমি নিজেকে দেখেছি যে, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম আর সাত জনের একজন ছিলাম আর কখনো গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কোন খাদ্য ছিল না অর্থাৎ আমাদের মাঝে এমন একটি যুগ এসেছিল যখন আমাদের খুবই শোচনীয় অবস্থা ছিল। আমরা গাছের পাতা খেতাম এমনকি ঠোঁটের কোণা পর্যন্ত ছিলে যেত। তিনি (রা.) নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমি একটি চাদর পেলাম, যেটিকে ছিঁড়ে আমার

এবং সা'দ বিন মালিকের জন্য দু'টুকরা করলাম। অর্থাৎ, আমাদের এমন অবস্থা ছিল যে, পুরো শরীর ঢাকার মতো একটি চাদরও ছিল না। অর্ধেকটা দিয়ে আমি গা ঢাকার কোমর বন্ধনী বানিয়ে নিলাম এবং বাকিটা দিয়ে সা'দ। তিনি বলেন, অথচ বর্তমানে আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ সকাল হতে না হতেই কোন না কোন শহরের আমীর হয়ে থাকে। আর আমি নিজেকে বড় মনে করা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই কেননা তাঁর নিকট আমি অতি নগণ্য। অতএব তিনি (রা.) বলেন, আমার বিনয়ের অবস্থা এমন যে, আমি নিজেকে খুবই তুচ্ছ জ্ঞান করি যদিও অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং স্বচ্ছলতা এসেছে। কাজেই, তোমাদের এখন অনেক বেশি ভাবা উচিত।

অতঃপর তিনি বলেন, অতীতের সকল নবীর যুগের প্রভাব-প্রতিপত্তিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তোমরা ভালোভাবে জেনে রাখ, আমাদের পরও শাসকদের শাসনামল শুরু হবে। তিনি (রা.) বলেন, মুসলমানদের মধ্যেও এমনটি অর্থাৎ, জাগতিকতা শুরু হয়ে যাবে। আর তখন তোমরা দেখে নিও, আমি যা বলছি তা কীভাবে সত্যে পরিণত হয়? কিন্তু তোমরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর ধর্মের প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি ঝুঁকবে, কেননা এর ফলেই জান্নাতে যাওয়ার উপকরণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু সায়েদার সদস্য ছিলেন; তার পিতার নাম ছিল উবাদাহ্ বিন যুলায়েম ও মাতার নাম ছিল আমরাহ্, যিনি মাসঊদ বিন কায়সের তৃতীয় কন্যা ছিলেন। তার মা'ও মহানবী (সা.)-এর কাছে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্, হযরত সা'দ বিন যায়েদ আশআলির খালাতো ভাই ছিলেন, যিনি বদরী সাহাবীদের মাঝে অন্যতম। হযরত সা'দ দু'টি বিয়ে করেছিলেন; তাদের একজন হলেন, গাযিয়া বিনতে সা'দ, যার গর্ভে সাঈদ, মুহাম্মদ ও আব্দুর রহমান জন্ম নেন; অপরজন হলেন ফুকায়হা বিনতে উবায়েদ, যার গর্ভে কায়েস, উমামা ও সাদূস-এর জন্ম হয়। মান্দুস বিনতে উবাদাহ্ হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌র বোন ছিলেন, যিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে বয়আত করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌র আরও একজন বোন ছিলেন, যার নাম ছিল লায়লা বিনতে উবাদাহ্; তিনিও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে বয়আত করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌র ডাকনাম ছিল 'আবু সাবেত'; কেউ কেউ তার ডাকনাম 'আবু কায়েস'-ও উল্লেখ করেছেন, তবে প্রথম বর্ণনা অর্থাৎ 'আবু সাবেত'-ই যথার্থ ও সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের নকীব বা নেতা ছিলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) সম্ভ্রান্ত ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন, আর সকল যুদ্ধে আনসারদের পতাকা তার কাছেই থাকতো। তিনি আনসারদের মধ্যে অসাধারণ সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন আর তার জাতি তার নেতৃত্ব মান্য করতো। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ অজ্ঞতার যুগেও আরবী লিখতে জানতেন, অথচ সে যুগে স্বল্প-সংখ্যক লোকই লিখতে জানত; তিনি সাঁতার ও ধনুর্বিদ্যায় দক্ষতা রাখতেন, আর এসব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি দক্ষতা রাখত তাকে 'কামেল' বা সম্পূর্ণ বলা হতো। অজ্ঞতার যুগে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ ও তার পূর্বে তার পিতা-পিতামহ তাদের দুর্গ থেকে ঘোষণা করাতেন– 'যার মাংস ও চর্বি পছন্দ, সে যেন দুলায়েম বিন হারসার দুর্গে চলে আসে'। হিশাম বিন উরওয়া তার

পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন, “আমি সা’দ বিন উবাদাহ্‌কে সেই সময় দেখেছি যখন তিনি তার দুর্গের ওপর থেকে ডেকে বলতেন- ‘যে ব্যক্তি চর্বি বা মাংস পছন্দ করে, সে সা’দ বিন উবাদাহ্‌র কাছে যাক’ (অর্থাৎ তিনি পশু জবাই করিয়ে তার মাংস বিতরণ করতেন)। আমি তার ছেলেকেও এরূপ করতে দেখেছি অর্থাৎ সে-ও এভাবে আহ্বান করত।” তিনি বলেন, আমি একদিন মদিনার রাস্তায় হাঁটছিলাম। সে সময় আমি যুবক ছিলাম। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন উমর (রা.) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় আমি যুবক ছিলাম এবং আব্দুল্লাহ্‌ বিন উমর আমার পাশ দিয়ে যান। তিনি ‘আলিয়া নামক স্থানে তার জমিতে যাচ্ছিলেন, যা মদিনা থেকে নাজাদ অভিমুখে চার থেকে আট মাইলের মধ্যে অবস্থিত একটি উপত্যকা। তিনি বলেন, হে যুবক! এদিকে আস। দেখ তো সা’দ বিন উবাদার দুর্গ থেকে কাউকে ডাকতে দেখা যায় কি? দুর্গটি নিকটেই ছিল। আমি দেখি এবং বলি, না। তিনি বলেন, তুমি সত্য বলেছ। মনে হচ্ছে সা’দ বিন উবাদাহ্‌ (রা.) যেরূপ দানশীল ছিলেন এবং যেভাবে তিনি বন্টন করতেন তার পরে সেই কাজ আর অব্যাহত থাকে নি। এজন্যই হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন উমর (রা.) তাকে একথা জিজ্ঞেস করেছেন।

হযরত নাফে’ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন উমর (রা.) হযরত সা’দ বিন উবাদাহ্‌ (রা.)’র দুর্গের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে বলেন, হে নাফে’! এগুলো তার পিতৃপুরুষদের বাড়ি। বছরে একবার আহ্বানকারী এই বলে ডাকতো, ‘যে ব্যক্তি চর্বি ও মাংস খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে সে যেন দুলায়েম এর বাড়িতে আসে’। এরপর দুলায়েম মৃত্যুবরণ করেন তখন উবাদাহ্‌ (রা.) এমন ঘোষণা প্রদান করেন আর যখন উবাদাহ্‌ (রা.) মুত্যুবরণ করেন তখন হযরত সা’দ (রা.) এমন ঘোষণা অব্যাহত রাখেন। এরপর আমি কায়েস বিন সা’দকেও এমনটি করতে দেখি আর কায়েস অসাধারণ দানশীল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

অতএব এই রেওয়ায়েতের মাধ্যমে আরো স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তার সন্তানাদি পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে সেই অবস্থা আর বহাল থাকে নি। হযরত সা’দ বিন উবাদাহ্‌ (রা.) আকাবাহ্‌র দ্বিতীয় বয়আতের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এই বর্ণনা এভাবে রয়েছে যে,

নবুয়্যতের ত্রয়োদশতম বছরের যিলহজ্জ মাসে হজ্জের সময় অওস এবং খাযরাজ গোত্রের কয়েকজন মক্কায় আসেন। তাদের মাঝে সত্তর ব্যক্তি এমন ছিলেন যারা হয় মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন অথবা মুসলমান হতে চাচ্ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য মক্কায় এসেছিলেন। মুসআব বিন উমায়ের (রা.)ও তাদের সাথে ছিলেন। মুসআব (রা.)’র মা জীবিত ছিলেন আর তিনি একজন মুশরিক মহিলা ছিলেন কিন্তু তাকে খুব ভালোবাসতেন। তার আগমনের সংবাদ শোনার পর তার মা তাকে বলে পাঠান যে, প্রথমে আমার সাথে সাক্ষাত কর এরপর অন্য কোথাও যেও। মুসআব (রা.) তার মাকে উত্তরে বলেন, আমি এখনও রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করি নি, তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আপনার কাছে আসবো। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাত করেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিবেদন করেন, এরপর নিজের মায়ের কাছে যান। তিনি তার সাথে প্রথমে সাক্ষাৎ করেন নি এ কথা জানতে পেরে তার মা গভীর মর্মবেদনা নিয়ে বসে ছিলেন। তাকে দেখে খুবই কান্নাকাটি করে অনেক অভিযোগ অনুযোগ করেন। মুসআব (রা.) বলেন, মা তোমাকে খুব ভালো একটি কথা বলি, যা তোমার জন্য খুবই উপকারী আর এর মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তিনি বলেন, সেটা কী? মুসআব

(রা.) খুবই ধীরেসুস্থে উত্তর দেন যে, ব্যস এটাই যে, প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যাও এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান নিয়ে আস। সে ঘোরতর মুশরিক মহিলা ছিল আর একথা শুনতেই তার মা এই বলে শোরগোল শুরু করে দেয় যে, তারকারাজির কসম! আমি কখনো তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করবো না অধিকন্তু তাকে ধরে বন্দি করার জন্য নিজের আত্মীয়দের প্রতি ইঙ্গিত করেন; কিন্তু মুসআব সতর্ক ছিলেন বিধায় দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যান।

আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সূত্রে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) মুসআব (রা.)'র মাধ্যমে আনসারদের আগমনের সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্য থেকে কতিপয় লোক তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু এ পর্যায়ে একটি দলীয় কিন্তু একান্তে সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল, এজন্য হজ্জের আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের পর মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হওয়া এবং প্রশান্তচিত্তে নিভৃতে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার জন্য যিলহজ্জ্ব মাসের মধ্যবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ সেদিন মাঝরাতের কাছাকাছি বিগত বছর যে উপত্যকায় মিলিত হয়েছিল সেই একই স্থান (নির্ধারিত হয়)। তিনি (সা.) আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তারা যেন একত্রে না আসেন, বরং একজন দু'জন করে নির্ধারিত সময়ে ঘাঁটিতে পৌঁছে যান এবং তারা যেন ঘুমন্তদের জাগ্রত না করেন এবং অনুপস্থিতদের জন্য অপেক্ষা না করেন। যারা উপস্থিত আছেন তারা যেন চলে আসেন। অতএব, নির্ধারিত তারিখে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহানবী (সা.) একা ঘর থেকে বের হন এবং পথে তাঁর চাচা আব্বাসকেও সাথে নেন, যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন কিন্তু মহানবী (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন এবং হাশেম বংশের নেতা ছিলেন। তারা দু'জন একত্রে সেই উপত্যকায় পৌঁছেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই আনসারগণও একজন দু'জন করে সেখানে পৌঁছেন। তারা সত্তর জন ছিলেন এবং সবাই অওস ও খাযরাজ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। মহানবী (সা.)-এর চাচা আব্বাস (রা.) প্রথমে কথা বলতে আরম্ভ করেন যে, হে খাযরাজ গোত্রীয়গণ! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বংশে সম্মানিত ও প্রিয়ভাজন এক ব্যক্তি এবং তাঁর বংশ এখন পর্যন্ত তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে আসছে। সব বিপদে তাঁর নিরাপত্তার জন্য তারা বুক পেতে দিয়েছে। কিন্তু এখন মুহাম্মদ (সা.) স্বীয় মাতৃভূমি ছেড়ে তোমাদের কাছে চলে যেতে চাইছেন। অতএব, তোমরা যদি তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে চাও তবে তোমাদেরকে তাঁর সব ধরনের নিরাপত্তা দিতে হবে এবং সব শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বুক পেতে দিতে হবে। যদি তোমরা এটি করতে প্রস্তুত থাক তবে ভালো, নয়তো এখনই স্পষ্টভাবে বলে দাও, কেননা স্পষ্ট কথা বলাই উত্তম। বারা বিন মা'রুর যিনি আনসারদের একজন প্রবীন নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বলেন আব্বাস আমরা তোমার কথা শুনেছি। কিন্তু আমরা চাই রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং তাঁর পবিত্র মুখে কিছু বলুন এবং যে দায়িত্ব আমাদের প্রতি অর্পণ করতে চান তা স্পষ্ট করুন। এতে মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআনের কতক আয়াত তিলাওয়াত করেন, অতঃপর সংক্ষিপ্ত এক বক্তৃতায় ইসলামের শিক্ষামালা তুলে ধরেন এবং 'হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ' অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, তোমরা নিজেদের আত্মীয়স্বজনের যেভাবে সুরক্ষা করে থাক, প্রয়োজনে আমার ক্ষেত্রেও অনুরূপ করবে– কেবল এটিই আমার প্রত্যাশা। তিনি (সা.) যখন বক্তৃতা শেষ করেন তখন আল-বারা বিন মা'রুর আরবের রীতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল

(সা.)! সেই খোদার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমরা আমাদের নিজ প্রাণের ন্যায় আপনার সুরক্ষা করব, আমরা তরবারির ছায়ায় বড় হয়েছি। কিন্তু তার কথা শেষ না হতেই আবুল হায়সাম বিন তাইয়্যেহান তার কথা থামিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মদিনার ইহুদিদের সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। আপনাকে সঙ্গ দেয়ার ফলে সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ্ আপনাকে বিজয় দান করবেন আর তখন আপনি আমাদেরকে ছেড়ে আপনার নিজের দেশে ফিরে আসবেন আর ফলে আমরা একূল ওকূল দু'কূলই হারাবো। এতে মহানবী (সা.) হেসে বলেন, না, না, এমনটি কখনোই হবে না। তোমাদের রক্ত আমার রক্ত হবে, তোমাদের বন্ধু আমার বন্ধু হবে, তোমাদের শত্রু আমার শত্রু হবে। এতে আব্বাস বিন উবাদাহ্ আনসারী নিজের সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, হে লোকসকল! তোমরা কি বুঝতে পারছ যে, এই অঙ্গীকারের অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে এখন তোমাদেরকে সর্বাবস্থায় সকল শ্রেণির মানুষের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে, তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আর সকল প্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এতে লোকেরা বললো, হ্যাঁ, আমরা অবগত আছি কিন্তু হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এর বিপরীতে আমাদের কী লাভ হবে? মহানবী (সা.) বলেনঃ তোমরা খোদা তা'লার জান্নাত লাভ করবে, যা তাঁর সব পুরস্কারের চেয়ে বড় পুরস্কার। তখন সবাই বলেন, এই ব্যবসায় আমরা একমত। হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। হুযূর (সা.) হাত বাড়িয়ে দেন। তারপর এই নিবেদিতপ্রাণ সত্তর জনের একটি দল প্রতিরক্ষামূলক চুক্তিতে হুযূরের (সা.) হাতে বিক্রি হয়ে যান। এই বয়আতের নাম 'আকাবার দ্বিতীয় বয়আত'।

এই বয়আতের পর মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, হযরত মূসা (আ.) নিজ জাতি থেকে বারোজন নকীব বা নেতা নির্বাচন করেছিলেন যারা হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক ছিলেন। আমি তোমাদের মধ্য থেকে বারোজন নেতা নিযুক্ত করতে চাই যারা তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সুরক্ষাকারী হবে, আর তারা আমার জন্য হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীতুল্য হবে এবং তারা আমার কাছে নিজ নিজ গোত্রের বিষয়ে জবাবদিহি করবে। কাজেই, তোমরা যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের নাম প্রস্তাবাকারে আমার সামনে উপস্থাপন কর। অতঃপর বারোজন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা হয় যাদেরকে মহানবী (সা.) অনুমোদন দান করেন এবং তাদের একটি করে গোত্রের নকীব বা নেতা নিযুক্ত করে তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেন আর কোন কোন গোত্রের জন্য দু'জন করে নকীব বা নেতা নিযুক্ত করেন। নেতা নির্ধারণ চূড়ান্ত হয়ে গেলে মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেন, তাদেরকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কেননা কুরাইশদের গুপ্তচর চারিদিকে নজরদারী করছে। এমন যেন না হয় যে এই কথা ও স্বীকারোক্তির খবর ফাঁস হয়ে জটিলতা সৃষ্টি হবে। সম্ভবত তিনি সবে এই জোরালো উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখনই রাতের আঁধারে উপত্যকা থেকে কোন শয়তানের ধ্বনি ভেসে আসে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি লুকিয়ে ছিল; গুপ্তচরবৃত্তি করছিল, সে বলল, হে কুরাইশরা! তোমাদের কি কোন খবর আছে, (নাঊযুবিল্লাহ্) মুযাম্মাম এবং তার সঙ্গীসাথি মুরতাদরা তোমাদের বিরুদ্ধে কী অঙ্গীকার ও চুক্তি করছে। এই আওয়াজ সবাইকে থমকে দিয়েছিল কিন্তু মহানবী (সা.) পুরোপুরি প্রশান্ত ছিলেন আর বলেন, আপনারা এখন যেভাবে এসেছিলেন সেভাবেই একজন দু'জন করে নিজেদের অবস্থানস্থলে ফিরে চলে যান। আব্বাস

বিন নাযলা আনসারী বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কাউকে ভয় পাই না। যদি আদেশ দেন তাহলে আজ সকালেই আমরা সেসব কুরাইশের ওপর আক্রমণ করে তাদের অত্যাচারের শাস্তি ভোগ করাবো। তিনি (সা.) বলেন, না, না, এখনও পর্যন্ত আমি এর অনুমতি পাইনি। তোমরা কেবল নীরবে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে যাও। এরপর সমস্ত লোকেরা একজন দু'জন করে ধীর পায়ে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যায় এবং মহানবী (সা.)ও তাঁর চাচা আব্বাসের সাথে মক্কায় ফিরে আসেন। কুরাইশদের কানে গুঞ্জন এসে পৌঁছে যে, এরূপ একটি গোপন সভা হয়েছিল, তাই সকাল হতেই তারা মদিনাবাসীদের আস্তানায় যায় এবং তাদেরকে বলে, আপনাদের সাথে আমাদের বহুদিনের পুরনো সম্পর্ক আর আমরা কখনো চাই না, এই সম্পর্ক নষ্ট হোক, কিন্তু আমরা শুনেছি, গত রাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে আপনাদের কোন গোপন চুক্তি অথবা সন্ধি হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা কি? অওস ও খাযরাজ গোত্রের যারা মূর্তিপূজারী ছিল তারা এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানত না, তাই তারা হতবাক হয় এবং স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে যে, নিশ্চিতভাবে এরূপ ঘটনা ঘটেনি। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল, যে পরবর্তীতে মদিনায় মুনাফিকদের নেতা হয়েছিল সে-ও এই দলে ছিল। সে বলল, এমনটি কখনো হতে পারে না। এটি কীভাবে সম্ভব যে, মদিনাবাসীরা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে আর আমি তা জানব না। মোটকথা, এভাবে কুরাইশদের সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং তারা ফিরে যায়। এর কিছু সময় পরই আনসারগণ মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু তাদের চলে যাওয়ার পরই কুরাইশরা কোনভাবে সেই সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আসলেই মদিনাবাসী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে কোন চুক্তি বা অঙ্গীকার করেছে। এরপর তাদের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি মদিনাবাসীদের পিছু নিয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে কাফেলা বের হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) কোন কারণে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। তাকে লোকেরা ধরে ফেলে এবং মক্কার পাথুরে মাঠে নিয়ে এসে অনেক মারধর করে এবং তার মাথার চুল ধরে এদিক সেদিক টানাহ্যাঁচড়া করে। সবশেষে জুবায়ের বিন মুতআম এবং হারেস বিন হারব যারা সা'দ এর পরিচিত ছিল তারা সংবাদ পেয়ে তাকে অত্যাচারীদের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনেন।

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) সম্পর্কে আরো কিছু ঘটনা বা বিবরণ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী খুতবায় তা বর্ণনা করা হবে।